## ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃতি

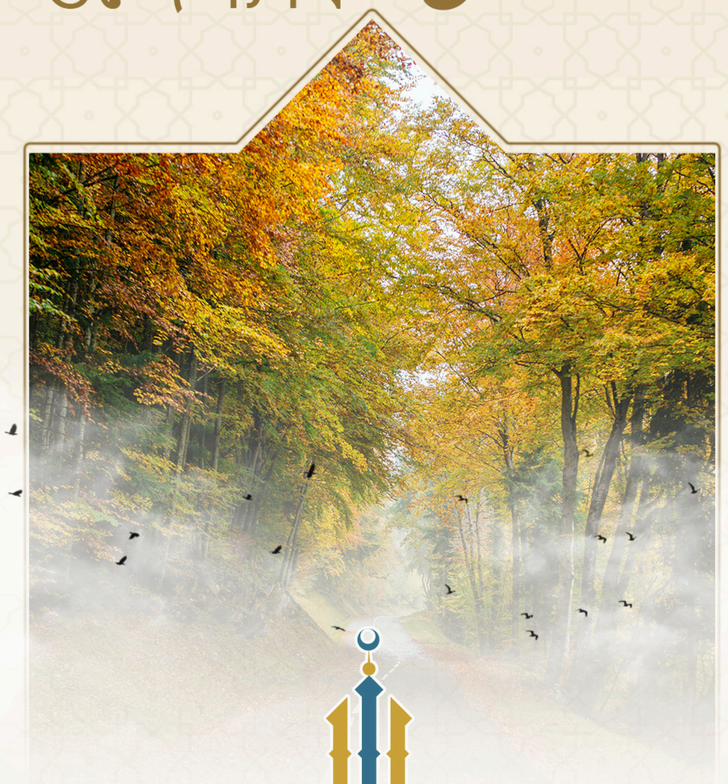

আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়ে আলোচনা করার সময়, ঈসা আঃ প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা উচিত; তার প্রকৃতি নিয়ে অনেক  বিভ্রান্তি ও রটনা থাকার কারণে।

কিছু খ্রিস্টান দাবি করে যে ঈসা আঃ হলেন মাবুদ বা তিনি ত্রিত্ববাদের তিনজনের একজন; পৃথিবীতে ইলাহকে মানুষের আকারে রূপদানের মাধ্যমে।

খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, ঈসা আঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি পানাহার করতেন, ঘুমাতেন ও সালাত আদায় করতেন এবং তিনি সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
এই গুণাবলী আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়। কেননা আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলী রয়েছে, অন্যদিকে মানুষেরা এর বিপরীত তাদের মাঝে এই পূর্ণতার অভাব রয়েছে। সুতরাং কিভাবে একই বস্তু একই সময়ে দুটি বিপরীত জিনিসের আকার ধারণ করতে পারে - অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ?! এটা বোধগম্য?

তথাপি কিছু মানুষ জিজ্ঞাসা করে যে, "আল্লাহ যদি সবকিছু করতে সক্ষম হোন, তবে তিনি কেন মানুষ হতে পারবেন না?"

উপাস্যের সংজ্ঞার উপর ভিত্তিতে, মাবুদ এমন কোন কাজ করতে পারেন না যা তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। তাই মাবুদ  যদি মানুষ হোন এবং মানবিক গুণাবলী ধারণ করেন তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে তিনি আর মাবুদ থাকবেন না।

অধিকন্তু, খ্রীস্টানদের নিকট থাকা পবিত্র গ্রন্থে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে ঈসা আঃ নিজেকে একজন আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় দেন; যা স্পষ্ট করে যে আল্লাহ তার থেকে আলাদা, তিনি আল্লাহ নন।

উদাহরণস্বরূপ, ম্যাথু ২৬:৩৯ এ বলা হয়েছে, "তিনি তার মুখের উপর ভর করে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।"

ঈসা আঃ যদি প্রকৃতপক্ষে ইলাহ হোন, তাহলে এটা কি বোধগম্য যে ইলাহ সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন? তাহলে তিনি কাকে সিজদা করছিলেন?

কিছু খ্রিস্টান দাবি করে যে "ঈসা আঃ হলেন ঈশ্বরের পুত্র"। আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "একথার বাস্তবিক অর্থ কি?"
বাস্তবিক অর্থে বা রূপক অর্থে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে অনেক উর্ধ্বে।

উপরন্তু, আমরা পায় যে, "আল্লাহর পুত্র" পরিভাষাটি প্রাচীন তাওরাতের ভাষায় "সৎ বান্দাদের" বুঝাতে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরিভাষাটি কেবল ঈসা আঃ এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং তা ওল্ড টেস্টামেন্টে দাউদ, সুলায়মান এবং ইয়াকুব আঃ মতো অনেক নবীর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, এক জায়গায় বলা হয়েছে, "...ইসরায়েল আমার প্রথমজাত পুত্র"। (এক্সোডাস ৪:২২)
﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ﴾
□ (আল্লাহ এমন নন যে, কোন সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র মহিমাময়।) সূরা মারইয়াম: ৩৫)
ইসলাম অনুযায়ী ঈসা আঃ প্রতি ঈমানই হল ঈসা আঃ এর প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক আক্বিদা, কারণ তা একই সাথে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর মহত্বের প্রতি ঈমানের হেফাযত করে।
ঈসা আঃ একজন সম্মানিত রাসূল ছিলেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

## তাহলে আমি এখানে কেন?

প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন চোখ, কান, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের অস্তিত্বের পিছনে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। তাহলে এটা কি যুক্তিযুক্ত নয় যে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষকে সৃষ্টির পিছনেও একটি উদ্দেশ্য আছে?

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া বেপরোয়াভাবে জীবনযাপন করার জন্য সৃষ্টি করেননি, অথবা তিনি আমাদের শুধুমাত্র পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেননি। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য, তা হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা করা; যাতে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি।
এই নির্দেশনা আমাদেরকে একটি সুখী ও বরকতপূর্ণ জীবনযাপনের দিকে পরিচালিত করে। এই পথনির্দেশ এমন সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যা ব্যক্তিকে উপকৃত করে, যেমন সালাত আদায় করা এবং সমাজকে উপকৃত করে, যেমন প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার, নিজের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ, আমানতদারিতা রক্ষা করা ও পশুদের প্রতি যত্নবান হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা-সে যেই হোক না কেন- হারাম করেছেন। যেমন মূর্তি, সূর্য, চাঁদ, আলেম, সন্ন্যাসী এমনকি নবীর ইবাদত করা। মহান আল্লাহর কোন অংশীদার বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে সরাসরি এবং যে কোন সময় আল্লাহর ইবাদত করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা এই জীবনকে একটি পরীক্ষাগার বানিয়েছেন এবং এই পরীক্ষা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। আমাদের সাথে যা ঘটবে তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তবে আমাদের সাথে যা ঘটবে তার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম একটি উপায় হল কষ্টের সময় ধৈর্য্যধারণ করা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর শুকরিয়া আাদায় করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন; যদি আমরা কুফরী করি বা তাঁর আদেশ অমান্য করি।

## সুতরাং এখন আমার কি করা আবশ্যক?

গবেষণা করার জন্য বুদ্ধিকে ব্যবহার করা, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তাঁর আদেশ অনুসারে জীবনযাপন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার মধ্যেই ব্যক্তির ঈমানী পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। আর তা করবে আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেকে নিবেদন করে।  এইগুলো করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি "মুসলিম" হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ ইসলামকে সকলের নাগালের অধীন করে দিয়েছেন, তাদের পূর্ববর্তী ধারণা বা আক্বিদা কিংবা বর্তমান অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ছাড়াই। তাই তো খুব সহজেই যে কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে; তা কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শাহাদাহ উচ্চারণ ও তাতে বিশ্বাস করা এবং এর অর্থ জানা ও সেই অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে:
((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।"

যে উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান হওয়া, সত্যকে গ্রহণ করা, এর কাছে আত্মসমর্পণ করা, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা এবং উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করার সময় কি এখনো আসেনি?


Our Official **WEBSITE**
To **DONATE** to projects

صباح السالم - قطعة 3 - شارع 304 - مبني 84 - دور 3 - مكتب 10
الخط الساخن: 9772 2526
واتساب: 9980 4542
albayan.kw@outlook.com


ما الغاية من الحياة؟
بنغالي

# এই জীবনের উদ্দেশ্য কি ?




جمعية البيان للتعريف بالإسلام
Al Bayan association to introduce Islam

# এই জীবনের উদ্দেশ্য কি?

> আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কেন এই জীবন লাভ করেছি? এবং মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব?

আমাদের অস্তিত্ব লাভ ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় মনের মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নগুলো জাগ্রত হয় তন্মেধ্যে একটি হল: "আমরা কোথা থেকে এসেছি?"

আমরা কি হঠাৎ করেই পরিকল্পনাহীন ও প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছি, নাকি একজন প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছি? একজন স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা আমাদের জীবন লাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার প্রথম ধাপ। স্রষ্টার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করার অনেকগুলো যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ রয়েছে।
তন্মধ্যে আমরা এখানে তিনটি কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করবো:

## ১. পৃথিবীর উৎপত্তি

পৃথিবীর উৎপত্তিই হল প্রথম প্রমাণ যা আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

আপনি কল্পনা করুন, মরুভূমি অতিক্রম করার সময় আপনি একটি ঘড়ি খুঁজে পেলেন। আমরা জানি যে একটি ঘড়ি কাঁচ, প্লাস্টিক এবং খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি। কাঁচ বালি থেকে তৈরি হয়, প্লাস্টিক পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয় এবং যমীন থেকে খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়। আর এই সবগুলো উপাদাই মরুভূমিতে পাওয়া যায়।
তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে ঘড়িটি নিজে নিজেই তৈরি করেছে? আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে সূর্য উদিত হয়েছে, বাতাস প্রবাহিত হয়েছে ও বজ্রপাত হয়েছে এবং তেল ভূপৃষ্ঠে ভেসে গেছে, অতঃপর তা বালি এবং খনিজ পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়েছে, তারপর লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ করেই পরিকল্পনাহীন ও প্রাকৃতিকভাবে ঘড়িটি তৈরী হয়েছে?

মানবিক অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ যুক্তির মাধ্যমে আমরা জানি যে, যে বস্তুর সূচনা আছে তা অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে না বা নিজেই নিজেকে তৈরি করতে পারে না।
সুতরাং সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হল এই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। যার অবশ্যই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান হওয়া আবশ্যক, কারণ তিনি এই সমগ্র মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং তা পরিচালনা করার জন্য "বৈজ্ঞানিক নীতিমালা" প্রণয়ন করেছেন।
এই সমস্ত গুণাবলীই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর সম্পর্কে মৌলিক ধারণা তৈরি করে। আর তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যা এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে মহাবিশ্ব সসীম এবং এর সূচনা রয়েছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকে যে, “আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?” আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, তিনি মাখলুক থেকে ভিন্ন। আল্লাহ চিরন্তন এবং তার কোন সূচনা নেই। সুতরাং আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে

## বিশ্বজগত সৃষ্টির নিপণতা

সর্বজ্ঞ স্রষ্টার অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ হল এই জটিল মহাবিশ্বের নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা ও ভারসাম্য।

এই মহাবিশ্বের অনেক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটাকে জীবনযাপন উপযোগী করার জন্য বিশেষভাবে নকশা করা হয়েছে। যেমন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্ব, পৃথিবীর ভূত্বকের পুরুত্ব, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপাত, এমনকি পৃথিবীর তাপমাত্রা, যদি এই পরিমাপগুলো বর্তমানের চেয়ে কিছুটা আলাদা হত তবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হত

সঠিকভাবে সময় দেয়ার জন্য ঘড়ির যেমন একজন বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতকারক আবশ্যক, অনুরূপভাবে এই পৃথিবীর একজন সর্বজ্ঞ স্রষ্টা থাকা আবশ্যক যিনি এটিকে সংরক্ষণ করে রাখেন। এই সব কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারে?

যখন আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং মহাবিশ্বের সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম নীতিমালা, নিয়ন্ত্রণ এবং সিস্টেমগুলোর পর্যবেক্ষণ করি, তখন এটি কি যৌক্তিক নয় যে এই সমস্ত কিছুর একজন নিয়ন্ত্রক রয়েছেন? এই নিয়ন্ত্রকের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল মহান আল্লাহর অস্তিত্ব - যিনি মহাবিশ্বের এই নীতিমালা তৈরি করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন: إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ [আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে,] রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।] সূরা আলে ইমরান: ১৯০।

## আল্লাহর পক্ষ হতে অহী

তৃতীয় প্রমাণ যা আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে তা হল প্রকৃত অহী যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ মানবজাতির কাছে পাঠিয়েছেন। ইসলামের কিতাব পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী তার কতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে এই প্রমাণগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া হল যা সাব্যস্ত করে যে কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বাণী।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য এই কিতাব নাযিল করেছেন, তাই এটি প্রত্যাশিত যে এই কিতাবে তাঁর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে।

• পবিত্র কুরআন ১৪০০ বছরেরও বেশি আগে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এতে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা নাযিলের সময় মানুষের কাছে জানা ছিল না; বরং তা সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। এর কতিপয় উদাহরণ হল, যেমন "পানি হল সকল জীবের উৎসমূল" (সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০), এবং সূর্য ও চাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে। (সূরা আল আম্বিয়া: ৩৩)

• পবিত্র কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে যা কুরআন নাযিলের সময় জানা ছিল না, সেইসাথে তাতে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা পরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

• কুরআন ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, তা যেকোন ধরনের ত্রুটি বা বৈপরীত্য হতে মুক্ত, যদিও তা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে।

• কুরআনুল কারীমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট, বিশুদ্ধ এবং সর্বজনীন বার্তা রয়েছে যা মানুষের সহজাত বিশ্বাসকে সম্বোধন করে।

• কুরআনুল কারীমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট, বিশুদ্ধ এবং সর্বজনীন বার্তা রয়েছে যা মানুষের সহজাত বিশ্বাসকে সম্বোধন করে।

• মানুষের উপর কুরআনের গভীর প্রভাব রয়েছে, যা শুধুমাত্র তারাই অনুভব করে যাদের হৃদয় এর মাধুর্যের স্বাদ আস্বাদন করেছে।

• কুরআনুল কারীম নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, যিনি ইতিহাসে নিরক্ষর মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুরআনের ভাষাশৈলী অনন্য এবং তাতে আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র ও ভাষাগত সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগ সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

কুরআনের বৈচিত্র্যময় ও মুজেযাপূর্ণ দিকগুলোর সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা হল তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

## আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্য দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করেন।

আমরা যখন স্বীকার করি যে একজন বিজ্ঞ স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তখন আমরা জানি যে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছ থেকে কী চান তা আমরা কীভাবে জানতে পারব? আমরা অভিজ্ঞতা ও ভুল থেকে কি এটা জানাব? নাকি আমরা নিজেরাই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্ধারণ করব? না আমরা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোককে অনুসরণ করব, যদিও তারা ভুল করে?
অবশ্যই না. আল্লাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে জানানোর জন্য রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং প্রতিটি জাতির জন্য কমপক্ষে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। সমস্ত রাসূলগণ একই বার্তা নিয়ে আগমন করেছেন: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা। এই রাসুলগণের মধ্যে ছিলেন আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালাম।

নবীদের ধারাবাহিকতার শেষ যোগসূত্র ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি সর্বকালের সবচেয়ে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, করুণাময় এবং সাহসী মানুষ ছিলেন। তাকে সর্বশেষ আল্লাহর অহী কুরআন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল; যেন তিনি মানুষদেরকে তাদের জীবনে কীভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে তা শিক্ষা দেন।

কুরআন হল হেদায়াতের কিতাব, যা আমাদের কাছে মানুষের জীবনের অনেক মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যা করে, যেমন আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং আল্লাহ কে।
কুরআন কোন আমলগুলো আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন এবং কোনগুলোকে তিনি অপছন্দ করেন ও তাতে রাগান্বিত হোন, সেইসাথে পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলী ও তার শিক্ষা বর্ণনা দেয় এবং তা আমাদেরকে জান্নাত, জাহান্নাম এবং কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সংবাদ দেয়।
অনুরূপভাবে কুরআনের লক্ষ্য হল আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলোকে সংশোধন করা, যেমন ঈসা আঃ প্রকৃতি ও তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট করা এবং তার সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রকৃতির তুলনা করা।

অন্যান্য নবীদের মতই ঈসা (আঃ) থেকে কিছু মুজেযা প্রকাশ পেয়েছিল এবং তিনি মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। (সূরা মারইয়াম:৩৬)